

## উইকিপিডিয়া

একটি মুক্ত বিশ্বকোষ

## উইকিপিডিয়া

# বাংলাদেশের ইতিহাস

**বাংলাদেশ** দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশটি বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

প্রথমে ইথিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির আগমন ঘটে ১২০৪ শতকে। এ সময় তিনি বাংলার পশ্চিমে নদীয়া ও উত্তর বাংলার কিছুটা অংশ দখল করেন। তবে, ১২০৬ সালে বিহার অভিযানে মারা যান।

বাংলাদেশের সভাতার ইতিহাস চার সহস্রাব্দেরও বেশি সময় ধরে সেই ক্যালকোলিথিক যুগ থেকে চলে আসছে। দেশটির প্রারম্ভিক ইতিহাস হচ্ছে আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধারণসমূহের মধ্যকার দ্঵ন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার ইতিহাস।

ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে। ব্রহ্মদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বখতিয়ার থিলজীর নেতৃত্বে সামরিক বিজয়ের পাশাপাশি শাহ জালালের মতো সুনি দাসীদের নিরলস প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে ইসলাম এদেশে প্রভাবশালী ধর্ম হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে মুসলিম শাসকরা মসজিদ নির্মাণ করে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে এই অঞ্চল শাহী বাংলা হিসেবে সুলতান শামসুন্দীন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক শাসিত হয় যা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হ্রাসিত করে এবং আঞ্চলিক সাধারণগুলোর উপর সামরিক আধিপত্যের সূচনা করে। ইউরোপীয়রা সেসময় এই শাহী বাংলাকে বাণিজ্যের জন্য সবচেয়ে ধনী দেশ বলে উল্লেখ করেন।<sup>[১]</sup> পরবর্তীতে এই অঞ্চলটি মুঘল সাধারণের অধীনে আসে এবং মুঘল সাধারণের সবচেয়ে ধনী প্রদেশ হিসাবে পরিগণিত হয়। বাংলা সুবাহ গাঁটা মুঘল সাধারণের জিডিপির প্রায় অর্ধেক এবং বিশ্ব জিডিপির ১২% উৎপাদন করে যা সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের থেকেও বেশী ছিল।<sup>[২][৩][৪][৫]</sup> এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রাথমিক শিল্পায়ন যুগের সূচনা করে। এ সময় রাজধানী শহর ঢাকার জনসংখ্যা এক মিলিয়ন ছড়িয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুঘল সাধারণের পতনের পর বাংলা নবাবদের অধীনে একটি আধা স্বায়ত্ত্বশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয় যার শাসনভাব শেষ পর্যন্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাতে ন্যস্ত হয়। তারপর ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ অঞ্চল দখল করে। বাংলা সরাসরি ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবে অবদান রাখে কিন্তু এর ফলে তার নিজের শিল্পায়ন ধ্রুব হয়ে যায়।<sup>[৬][৭][৮][৯]</sup> পরবর্তীতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলা ও ভারতের পৃথক্কীকরণের মাধ্যমে আধুনিক বাংলাদেশের সীমানা প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের ফলে এই অঞ্চলটি নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়।<sup>[১০]</sup>

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর নয় মাস ব্যাপী সংগঠিত হওয়া রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতার পর নতুন রাষ্ট্রটি দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যাপক দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামরিক অভ্যর্থনার মত অসংখ্য সমস্যার মুখোখথৰ্থি হয়। ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পরে দেশটিতে আপেক্ষিক শান্তি স্থাপিত হয় এবং দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মানবসম্পদ ও পোশাকশিল্পে অগ্রগতির মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় শীর্ষ অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়ে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি করেছে।<sup>[১১][১২]</sup>

## বাংলা শব্দের উৎপত্তি

'বাংলা' বা 'বাংগালা' শব্দটির সঠিক উৎপত্তি অজানা রয়েছে। সম্ভবত ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি এ অঞ্চলে বসবাসকারী দ্বাবিড় গোষ্ঠী 'বঙ' থেকে 'বঙ' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। অন্যান্য সূত্র থেকে ধারণা করা হয় যে অঙ্গীকৃত জাতির সূর্যদেবতা "বোঙা" থেকে বঙ কথাটির উদ্ভব হয়েছে। মহাভারত, ভারতীয় পূর্বাণ ও হরিবংশের মতে রাজা বলির বঙ নামে এক ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন যিনি প্রাচীন 'বঙ রাজা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।<sup>[১৩]</sup> রাষ্ট্রকুট রাজা তৃতীয় গোবিন্দের নেসারী শিলালিপিতে প্রথম 'বঙ্গলা' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে যেখানে ধর্মপালকে 'বঙ্গলার রাজা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে বাংলা আক্রমণকারী চোল সাধারণের রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোলার নথি নিশ্চিত করে যে, সে সময় গোবিন্দচন্দ

বাংলার শাসক ছিলেন। সেই নথিতে বাংলাকে "বাঙ্গালা-দেশ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাংলার বর্ষাকালের স্পষ্ট বর্ণনাস্বরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, বাঙ্গালা-দেশ যেখানে কখনও বৃষ্টি থামেনা। [১৪] সুলতান ইলিয়াস শাহ "শাহ-ই-বাঙ্গালাহ" নামক উপাধি গ্রহণ করেন এবং তারপর থেকে সকল মুসলিম সুব্রহ্মে বাংলাকে বাঙ্গালাহ বলা হয়েছে। [১৫]

বর্তমান আধুনিক বাংলাদেশের কিছু অংশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশে বঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়েছিল। প্রাচীনকালে বাংলাদেশের দুটি প্রভাবশালী সম্প্রদায় ছিল বঙ্গ ও পুঞ্জ। [১৬]



৫৫১ খ্রিস্টাব্দে মহাজনপদ বঙ্গ; অধুনা বঙ্গ বা বাংলা ভূমি ইতিহাসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যা সুপ্রাচীন রাজ্য ও জনবসতি থেকে উদ্ভূত হয়।

## প্রাচীন বাংলা

### প্রাক-ইতিহাসিক বাংলা

অক্রাফোর্ড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সম্পর্কে কোন ধরনের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয়; এ সময় বাংলায় ইলো-আর্য, দ্বাবিড় ও মঙ্গোলয়েডদের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং তাদেরই মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের নাম ছিল বঙ্গ। [১৭]

বাংলা বংশীপটি কয়েক সহস্রাব্দ ধরে ঘন জঙ্গল ও জলাভূমির দ্বারা গঠিত হয়েছে। এই অঞ্চলের একটি বড় অংশ সুদীর্ঘ সময় ধরে এভাবেই স্থায়ী ছিল। এরপর মানুষের পদচারণায় জঙ্গলের ক্ষতি সাধিত হয়। তবে মানুষ ঠিক করে প্রথম বাংলায় প্রবেশ করে সে ব্যাপারে গবেষকদের মধ্যে ঐক্যমত্য নেই। একদল গবেষক দাবি করেন যে, মানুষ ৬০,০০০ বছর আগে চীন থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছিল। অন্য আরেকটি দলের মতে; ১০০,০০০ বছর আগে এখানে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল। এই অঞ্চলে প্রাণিগতিহাসিক মানুষের উপস্থিতির প্রমাণ খুবই দুর্বল। [১৮] এখানে নিওলিথিক ও ক্যালকোলিথিক যুগের মানুষের উপস্থিতির খুব একটা প্রমাণ মেলে না। ধারণা করা হয় যে, এই প্রমাণ না থাকার পেছনে নদীর গতিপ্রকৃতি পরিবর্তনই দায়ী। [১৯] বাংলাদেশের জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থান স্পৃশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক অবশিষ্টাংশের জন্য উপযুক্ত নয়। পাথরের অভাবে প্রাচীন বাংলার মানুষ সম্ভবত কাঠ ও বাঁশের মতো উপকরণ ব্যবহার করত যা সময়ের সাথে সাথে টিকে থাকতে পারে নি। তাই দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিকরা বাংলাকে ব্যতিরেকে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের উপর চৰ্চা করছিলেন। আর যেসব প্রত্নতাত্ত্বিকরা বাংলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, তারাও প্রাচীন নয়, বরং বাংলার সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে মনোনিবেশ করেন। [১৯]



মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন লিপি



উয়ারি-বটেশ্বরের প্রাচীন প্রত্নস্থান

বাংলা বংশীপে যে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলো পাওয়া গিয়েছে তার পুরোটাই এই বংশীপের চারপাশের পাহাড়গুলো থেকে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পূর্ব ভূখণ্ডে বাংলার প্রাচীন লোকদের ব্যাপারে তথ্য সরবরাহের সর্বোত্তম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। লালমাই, সীতাকুণ্ড এবং চান্দ্রাপুঁজিতে জীবাশ্ম কাঠ তৈরীর ল্লেড, স্ক্যাপার ও কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে যা বার্মা ও পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত আবিষ্কারের অনুরূপ। এছাড়া উত্তর পূর্ব বাংলাদেশে বড় বড় প্রাণিগতিহাসিক পাথরের পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে কৃষিকাজের প্রচলন ছিল। পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী কৃষি সমাজের প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। [১৮]

কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে একটি স্থির সংস্কৃতির জন্ম দেয়। ফলে একদিকে যেমন শহর-নগর গড়ে উঠে, অন্যদিকে সামুদ্রিক বাণিজ্য ও প্রাচীন রাজনীতিরও উদ্ভব হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা উয়ারি-বটেশ্বরে একটি বন্দর আবিষ্কার করেছেন যা প্রাচীন রোম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করত। তারা সেখানে মুদ্রা, মণিশিল, লোহার তৈরী প্রত্নসম্পদ, ইটের রাস্তা ও একটি দুর্গ আবিষ্কার করেছেন। আবিষ্কারগুলো প্রমাণ করে যে, অঞ্চলটি ছিল একটি শুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র, যেখানে লোহা গলানো এবং মূল্যবান পাথরের পুঁতির মতো শিল্প ছিল। স্থানটিতে মাটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। মাটি ও ইট প্রাচীর নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হত। মাটির তৈরি সবচেয়ে বিখ্যাত পোড়ামাটির ফলকগুলো চন্দ্রকেতুগড় থেকে এসেছে এবং তা দেবতা, প্রকৃতি ও সাধারণ জীবনের দৃশ্য চিত্রিত করেছে। উয়ারি-বটেশ্বর এবং চন্দ্রকেতুগড়ে (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) আবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রাগুলোয় নৌকা চিত্রিত রয়েছে। [১৮]

বাংলাদেশ সংগঠিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের NBPW (উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণ চিঙ্গল মৎপাত্র) যুগের (৭০০-২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) নির্দশন প্রকাশ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে লোহ যুগের সংস্কৃতি প্রায় ৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শুরু হয় এবং ৫০০-৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। উত্তর ভারতের ১৬টি মহা রাজ্য বা মহাজনপদের উত্থান এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে এই যুগ বিবরজন্মান ছিল।<sup>[১৯]</sup> প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চল, বর্তমান সময়ের বাংলাদেশ বা প্রাচীণ বঙ্গ রাজ্য এই মহাজনপদগুলির অংশ ছিল, যা ষষ্ঠ শতকে সমৃদ্ধ হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।<sup>[২০]</sup>

৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তাষলিপি (বর্তমান তমলুক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত), মহাস্থান এবং ময়নামতীর মতো উন্নত শহর গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে প্রধান শহরগুলো সমুদ্রতীরের পরিবর্তে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠতে দেখা যায়।<sup>[১৭]</sup> মহাস্থান থেকে বাংলাদেশের প্রাচীনতম লেখা একটি পাথরের শিলালিপি আবিস্কৃত হয় যা থেকে বোঝা যায় যে, স্থানটি মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি শুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। মহাস্থান তখন একটি প্রাদেশিক কেন্দ্র ছিল বলে ধারণা করা হয়। প্রাকৃত ভাষায় লেখা এই শিলালিপিতে জরুরী পরিস্থিতিতে সরবরাহ মজুত করার আদেশ রয়েছে। শিলালিপিটির নাম মহাস্থান বাস্তী শিলালিপি। বাংলা ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত। সে সময় পশ্চিমবঙ্গের তাষলিপিটি ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের খুবই শুরুত্বপূর্ণ একটি বন্দর।<sup>[১৮]</sup>

বাংলার প্রাচীন অঞ্চলগুলো হচ্ছে ভাগীরথী-ভৃগুলী অববাহিকা, হরিকেল, সমতট, বঙ্গ ও বরেন্দ্র।<sup>[২১]</sup> বঙ্গ ছিল বাংলার মধ্যাঞ্চল, হরিকেল ও সমতট বাংলার পূর্বাঞ্চল এবং বরেন্দ্র ছিল বাংলার উত্তরাঞ্চল। স্থানগুলোর নাম এই ইঙ্গিত দেয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তিহুতী-বার্মান, অস্ট্রো-এশীয় এবং দ্বাবিড় ভাষায় কথা বলতেন। ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে এখানে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা লক্ষণীয় হয়ে উঠে।<sup>[২২]</sup>

ভাষাগতভাবে, এই ভূখণ্ডের প্রাচীনতম জনগাঁও হয়তো দ্বাবিড় ভাষায় কথা বলত যেমন কুরুক্ষ, বা সন্তবত অস্ট্রো-এশীয় ভাষায় কথা বলত যেমন সাঁওতাল। পরবর্তীকালে, তিহুতী-বার্মানের মতো অন্যান্য ভাষা পরিবারের লোকেরা বাংলায় বসতি স্থাপন করে। সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল মগধের অংশ হিসেবে ইন্দো-আর্য সভ্যতার অংশ হয়ে উঠেছিল। নব রাজবংশ হচ্ছে প্রথম ঐতিহাসিক রাষ্ট্র যা ভারতী-আর্য শাসনের অধীনে বাংলাদেশকে একত্রিত করেছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের উত্থানের পর অনেক পুরোহিত ধর্ম বিশ্বারের জন্য এখানে বসতি স্থাপন করেছিল এবং মহাস্থানগুলোর মতো অনেক শক্ত স্থাপন করেছিল।

## প্রথমদিকের উপনিবেশায়ন

বাঙালী জাতি প্রাচীন ভারতের একটি পরাক্রমশালী সমৃদ্ধ অভিযানী জাতি ছিল। শুধু বাঙালী জাতিই নয়, প্রাচীনকালে ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জাতি, যেমন বাঙালী, কলিঙ্গী, তামিল প্রভৃতি জাতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নানা উপনিবেশ গড়ে তুলতেন। তারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে এরকম একটি বিবর্ত সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এটি শ্রী বিজয় সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। ভিয়েতনামের ইতিহাসে উল্লেখ আছে ভারতবর্ষের বন-লাং (বাংলা) নামক দেশ (থেকে লাক লাং (লক্ষণ?) নামক এক ব্যক্তি ভিয়েতনামে গিয়ে "বন-লাং" নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই বন-লাং যে ভারতবর্ষের বাংলা সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই বাঙালীদের রাজ্য খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।<sup>[২৩]</sup> অপরদিকে শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে উল্লেখ আছে বঙ্গ দেশ (থেকে আগত বিজয় সিংহ নামে এক ব্যক্তি স্থানীয় দ্বিবিড় রাজাদের পতন ঘটিয়ে সিংহল (সিংহ বংশীয়) নামে একটি নতুন রাজ্যের পতন করেন। বিজয় সিংহকে সিংহলী জাতির পিতা হিসেবে পরিগণিত করা হয়। বিজয় সিংহকে নিয়ে শ্রীলঙ্কায় একটি মহাকাব্যও রয়েছে যা "মহাবংশ" নামে পরিচিত।<sup>[২৪]</sup>

## নব সাম্রাজ্য

নব সাম্রাজ্য ছিল বাংলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় যুগ। এই যুগে বাংলার শক্তিমত্তা ও প্রাচুর্য শীর্ষে আরোহণ করে। এই যুগে বাংলা সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। নব রাজাদের জন্ম হয়েছিল বাংলায়। তারা বাংলা (থেকে মগধ (বিহার) দখল করে এবং উভয় রাজ্যকে এক্যবদ্ধ করে বঙ্গ-মগধ নামে একটি নতুন সাম্রাজ্যের পতন করে। প্রাচীন শ্রিক ইতিহাস বাংলাকে গঙ্গারিডাই এবং মগধকে প্রাসি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রিক ইতিহাসে এই সংযুক্ত রাজ্যকে গঙ্গারিডাই ও প্রাসি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাপদ্ম নব ছিলেন নব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী ব্যাপক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি কোশল (উত্তর প্রদেশ), কুরু (পূর্ব পাঞ্চাব), মৎস্য (রাজপুতনা), চেদী (মধ্য প্রদেশ ও বিহারের মধ্যস্থিত জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল), অবন্তী (মধ্য প্রদেশ) প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। দিগ্নিজয়ার্থে মহাপদ্ম এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন। তৎকালীন ইতিহাস অনুসারে মহাপদ্মের অধীনে ২,০০,০০০ পদাতিক, ২০,০০০ অশ্বারোহী, ৪,০০০ যুদ্ধরথ ও ২,০০০ হস্তীবাহিনী ছিল। মতান্তরে তার নিকট ২,০০,০০০ পদাতিক, ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ৮,০০০ যুদ্ধরথ ও ৬,০০০ হস্তীবাহিনী ছিল।

"কথাসুরিৎ সাগর" থেকে জানা যায় তিনি দক্ষিণ ভারতেরও বিরাট অংশ জয় করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের কলিঙ্গ ও অশ্মক এ রাজ্য দুটো জয় করেছিলেন। অশ্মক হচ্ছে মহারাষ্ট্রের পূর্ব অংশে একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম। এটি দক্ষিণ ভারতে আধ্যদের একটি বিখ্যাত উপনিবেশ ছিল। কলিঙ্গ হচ্ছে উড়িষ্যার প্রাচীন নাম। কলিঙ্গের হস্তগুম্ফ শিলালিপি থেকে জানা যায় মহাপদ্ম কলিঙ্গে জল সচের জন্য একটি বিরাট জল প্রণালী নির্মাণ করেছিলেন। তিনি কলিঙ্গ থেকে একটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি ও রাজধানীতে নিয়ে যান। মহাপদ্ম ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথমবারের মত একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হন। সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করে তিনি একরাট উপাধি গ্রহণ করেন। পরে তাকে অনুসরণ করে পশ্চিম ভারতের রাজারা বিরাট ও দক্ষিণ ভারতের রাজারা সম্ভাট উপাধি গ্রহণ করে।

মহাপদ্ম নন্দের পর ক্ষমতায় আসীন হন তার পুত্র ধননন্দ বা উগ্রনন্দ। ধননন্দের সময় রাজ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভব্য দেখা দেয়। ধননন্দের সময়ে পাটলিপুত্রে পাঁচটি ধর্মস্তুপ নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ইতিহাসে ধননন্দকে অর্থপিপাসু রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

উগ্রনন্দের বা ধননন্দের সময় গ্রিক সম্ভাট আলেকজাঞ্চার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু উগ্রনন্দ একটি বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আলেকজাঞ্চারের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হন। ক্ষতার্ক বলেছেন, রাজা পুরুষাত্মের (পোরাস) সাথে যুদ্ধের পর মেসিডোনিয়ার সৈন্যরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আরও প্রবেশের জন্য অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। তারা জানতে পারে গঙ্গা নদী যা ২৩০ ষ্টেডিয়া বিস্তৃত ছিল এবং ১০০০ ফুট গভীর ছিল, তার পাশের সমস্ত তীর সশস্ত্র যোদ্ধা, ঘোড়া এবং হাতি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আবৃত ছিল। গঙ্গারিডাই ও প্রাসী এর রাজা তার (আলেকজাঞ্চার) জন্য ২,০০,০০০ পদাতিক, ৮০,০০০ অস্বারোহী বাহিনী, ৮,০০০ যুদ্ধরথ ও ৬,০০০ হস্তিবাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।<sup>[২৪]</sup>

## মৌর্য সাম্রাজ্য

মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনকালে মহাস্থান (পুঁজুনগর) কেন্দ্রীয় অঞ্চল ছিল বলে ধারণা করা হয়। তৃতীয় মৌর্য সম্ভাট অশোকের ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা শিলালিপি এখানে পাওয়া গিয়েছে।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে (মৌর্য শাসনকালীন গ্রন্থ) বলেছেন, পুঁজুর কৌষেয় বস্ত্র মরকত মণির মতো মসৃণ। একে পৌঞ্জিকা বলা হয়েছে।<sup>[২৫]</sup> এ ধরনের বস্ত্র শুধু মগধ ও পুঁজু উৎপন্ন হতো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গল্পে বঙ্গের এক প্রকার বস্ত্রকে "বাঞ্জিকা" বলা হয়েছে যা শ্বেত বর্ণের হতো।<sup>[২৬]</sup> সর্বোপরি এ গল্পে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের প্রশংসন করা হয়েছে।

## ধ্রুপদী যুগ

### গৌড় সাম্রাজ্য

ষষ্ঠ শতকের মধ্যে উত্তর ভারত শাসনকারী বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে মগধ (বিহার) ও মালব (মধ্য প্রদেশ) এ রাজ্য দুটি গুপ্ত বংশের দুটি শাখা দ্বারা শাসিত ছিল। অপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল উত্তর প্রদেশের মৌখিকী রাজ্য এবং পাঞ্জাবের পুষ্যভূতি রাজ্য। শশাঙ্ক ছিলেন মগধের গুপ্ত সম্ভাট মহাসেন গুপ্তের একজন সীমান্তবর্তী মহাসাম্রাজ্য। মহাসেন গুপ্তের পর তিনি বাংলার ক্ষমতা দখল করেন এবং গৌড়ের কর্ণসূবর্ণে তার রাজধানী স্থাপন করেন। শশাঙ্ক ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং সেখানকার শৈলোন্দ্রের বংশীয় রাজাকে পরাজিত করে উড়িষ্যা দখল করেন। এ সময় উত্তর ভারত দখলের জন্য বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে তীব্র প্রতিবন্ধিতা শুরু হয়। মালবের রাজা দেবগুপ্ত মৌখিকী রাজা গ্রহবর্মণকে পরাজিত করে কনৌজ দখল করেন। কিন্তু একই সময় পুষ্যভূতির রাজা রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করেন। এ সময় শশাঙ্ক কনৌজ আক্রমণ করেন। তিনি কনৌজের অধিকারী রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত ও নিহত করে ক্ষমতা দখল করেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তার ভাই ও উত্তরাধিকারী হর্ষবর্ধন এক বিপুল বাহিনী গঠন করেন। শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করেন। কিন্তু হর্ষবর্ধন ছিলেন অত্যধিক শক্তিশালী যোদ্ধা। হয় বৎসর ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করার পর শশাঙ্ক শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। হর্ষবর্ধন বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করে নেন। এভাবে বাংলার ক্ষণস্থায়ী গৌড় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

### পাল রাজবংশ

পাল সাম্রাজ্যের যুগ ছিল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এ সময় বাংলার ইতিহাসে আবার দিঘিজয়ের সূচনা হয়। পাল রাজাগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে। একারণে পাল শিলালিপিতে বরেন্দ্রকে জনকৃত বা রাজ্যাম পিত্রাম বলা হয়েছে। পাল সাম্রাজ্যের রাজাগণ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। পাল রাজাগণ ছিলেন প্রথমত

বৌদ্ধধর্মের মহাযান ও পরবর্তীতে তান্ত্রিক শাখার অনুসারী। পাল বংশীয় রাজাগণ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রভূমি কনৌজ দখলের জন্য রাজপুতানার শুরুর এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকুটদের সাথে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই ভয়ঙ্কর ও ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধ পরবর্তী দুই শত বৎসর অব্যাহত থাকে।

পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা গোপাল। তিনি ৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশ শাসন করেন। গোপালের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশ পাচটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল যথা- অঙ্গ, বঙ্গ, গোড়, সুন্ধ ও সমতট। গোপাল এই সমস্ত খণ্ডকে এক্রিবদ্ধ করেন ও বাংলাদেশে শাস্তি শৃঙ্খলা আনয়ন করেন।<sup>[২৭]</sup> গোপাল বিহার, উড়িষ্যা ও কামরূপও দখল করেন। এরপর গোপাল উত্তর ভারতের রাজধানী কনৌজ অক্রমণ করেন। তিনি কনৌজের আয়ুধ বংশীয় রাজা বজ্রায়ুধকে পরাজিত করে কনৌজ দখল করেন। কিন্তু শুরুর রাজা বৎসরাজের নিকট তিনি পরাজিত হন। বৎসরাজ পরবর্তীতে রাষ্ট্রকুট রাজা দ্বিব ধারাবর্ষের নিকট পরাজিত হন। ফলে গোপাল তার সাধার্জ্য রক্ষা করতে সক্ষম হন।



পাল সাধার্জ্য এবং এর পার্শ্ববর্তী  
রাজ্যসমূহ

গোপালের পুত্র ধর্মপাল (৭৯০-৮১০) ছিলেন একজন সুদক্ষ ও পরাক্রমশালী সম্রাট। তিনি উত্তর ভারতে আক্রমণ করেন এবং শুরুর রাজা নাগভট্টকে পরাজিত করে কনৌজ দখল করেন। তিনি সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী বিশাল সামরিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। খালিমপুর তাষ্ণশাসন থেকে জানা যায় তিনি মদ্র (পাঞ্চাব), গান্ধার (খাইবার প্রদেশ), মৎস (বারাজস্থান/রাজপুতানা), যদু(পুরাতত), অবস্তী (মধ্য প্রদেশ) প্রভৃতি অঞ্চল বিজয় করেছিলেন।<sup>[২৮]</sup> কিন্তু এ অঞ্চলগুলো তিনি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেন নি। ধর্মপাল সেনাপতি লাউসেনের নেতৃত্বে রাষ্ট্রকুট রাজাকে পরাজিত করে উড়িষ্যা পুনর্দখল করতে সক্ষম হন। এই ঘটনাটি তৎকালীন বিখ্যাত মহাকাব্য ধর্ম মঙ্গলে উল্লেখ আছে।

ধর্মপালের সুযোগ্য পুত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০) পুনরায় সমগ্র ভারতব্যাপী তার অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতে কংষাজ (কাশ্মীর) পর্যন্ত তার সমরাভিযান পরিচালনা করেন। দেবপাল শুরুর রাজা রামভদ্রকে পরাজিত করে তাকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন। বিক্ষ্যা পার্বত অঞ্চল বিজয় করে তিনি মালব ও শুজরাত দখল করেন।<sup>[২৯]</sup> কিন্তু এ অঞ্চলগুলো পরবর্তীতে তিনি মিহির ভোজ/মিহির ভোজের কাছে হারিয়ে ফেলেন। দেবপালের দাক্ষিণাত্য অভিযান সফল হয়েছিল। তার নির্দেশে দ্রাতা জয়পাল রাষ্ট্রকুট রাজা অমোघবর্ষকে পরাজিত করে উড়িষ্যা পুনর্দখল করেন। এরপর উড়িষ্যা চিরস্থায়ীভাবে পাল সাধার্জ্যের শাসনাধীনে ছিল।



বাংলাদেশের সোমপুর মহাবিহার হলো  
ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ বিহার  
, যা ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত।

পাল সম্রাটগণ বহু বৌদ্ধবিহার ও ধর্মীয় পীঠস্থান নির্মাণ করেছিলেন। বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী ও জগদ্দল প্রভৃতি বৃহদায়তন মহাবিহার পাল স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পাল সম্রাটগণ প্রথমত "মহাযান" বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে পালগণ হিন্দুদের বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করেন। বহু হিন্দু দেবদেবীকে এই ধর্মে স্থান দেওয়া হয়। পাল সম্রাটগণ সংস্কৃত বা পালি ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষ্য হিসেবে ঘোষণা করেন। পাল রাজাদের সময়ই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নির্দর্শন চর্যাপদসমূহ রচিত হয়। তাই পাল রাজবংশকে অনেক সময় বাংলা সাহিত্যের জনক মনে করা হয়।

## সেন রাজবংশ

সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন প্রাথমিক জীবনে পাল রাজাদের অধীনে দক্ষিণবঙ্গের এক সামন্তপ্রভু ছিলেন। পরে তিনি নিজ বাহ্বলে সাধার্জ্য বিভাগ করে পূর্ববঙ্গের বর্মণ রাজাদের পরাজিত করেন। তিনি উত্তরবঙ্গের এক যুদ্ধে পাল সম্রাট মদনপালকে পরাজিত করে রাজধানী গোড় দখল করেন। তিনি ব্রিত্ত (উত্তর বিহার) ও কামরূপও (পশ্চিম আসাম) জয় করে নেন। তবে তিনি দক্ষিণ বিহার জয় করতে ব্যর্থ হন। পাল রাজাগণ এখানে গাহড়বাল সাধার্জ্যের সহায়তায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। বিজয়সেন শৈব ধর্মের ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তার সময় কনৌজ, অযোধ্যা ও হরিদ্বার থেকে যেসমস্ত কায়স্থ এদেশে আসেন তারাই মূলত বাঙালী কায়স্থদের আদিপুরুষ।

বল্লাল সেন বিজয়সেনের পর বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। বল্লাল সেন তার রাজ্যের প্রায় ১,০০০ ব্রাহ্মণকে চিহ্নিত করেন। এদেরকে রাজ পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংবন্ধ করা হয় এবং এদের উচ্চ পদ মর্যাদা প্রদান করা হয়। এই মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ রাজ্য কুলীন নামে পরিচিত হয়। বল্লাল সেন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দানসাগর ও অন্তর্তসাগর নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ দুটো থেকে তার অভূতপূর্ব প্রতিভাব পরিচয় পাওয়া যায়। বল্লাল সেনের সময় বঙ্গদেশে শৈব, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ দেখা দেয়। বল্লালসেন ব্যক্তিগতভাবে তান্ত্রিক মতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, যদিও তার পিতা বিজয়সেন শৈব মতের অনুসারী ছিলেন।

বল্লাল সনের পর তার পুত্র লক্ষণ সেন সিংহাসনে আসীন হন। পিতার মত লক্ষণ সেনও সাহিত্য ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তার সময়ে রাজ্যে বহু প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব হয়। যমন শরণ, হলায়ুধ, উমাপতিধর প্রমুখ। ধর্মীয় মতের দিক থেকে লক্ষণ সেন ছিলেন বৈষ্ণব। আনুলিয়ায় প্রাপ্ত তাষ শাসনে লক্ষণ সেনকে পরমবৈষ্ণব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণ সনের সময় বখতিয়ার খিলজী বাংলা আক্রমণ করেন। এসময় লক্ষণ সেন নদীয়ার একটি তীর্থকেন্দ্রে অবস্থান করছিলেন। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজী অর্তকিতে নদীয়া আক্রমণ করেন যার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। লক্ষণ সেন পূর্ব বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, মুসলমানরা পূর্ববঙ্গ জয় করতে ব্যর্থ হয়।

## দেব রাজত্ব

দেব রাজ্য ছিল বাংলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে আরাকানের দান্যবতী বংশের একটি রাজ্য। এই রাজ্যটি বিস্তৃত ছিল আরাকান হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং এর রাজধানী ছিল চট্টগ্রামে। কিন্তু স্থানীয় বাঙালী প্রভাবে দেব রাজাগণ বাঙালী ও হিন্দু হয়ে পড়ে। এই রাজবংশের প্রথম শাসক ছিলেন পুরুষাত্ম দেব, যিনি প্রথম জীবনে একজন সাধারণ গ্রামিক (গ্রাম প্রধান) ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি সেন সম্রাটদের অধীনে দক্ষিণাঞ্চলের প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন। তার পুত্র মধুসূদন দেব প্রথম সেন সাম্রাজ্যের হাত থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নৃপতি উপাধি ধারণ করেন। দামোদর দেব এই রাজবংশের একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তার রাজত্ব বর্তমান কুমিল্লা-নোয়াখালী-চট্টগ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।<sup>[৩০]</sup>

এই রাজবংশের পরবর্তী শাসক দশরথ দেব এই বংশের সবচেয়ে পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন। তিনি সেন সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান এবং সমগ্র পর্ববঙ্গ ( ঢাকা-ময়মনসিংহ-খুলনা) অঞ্চল দখল করে নেন। তিনি দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সাথে মিত্রতা করে আগ্রাসনকারী মুঘীসউদ্দীন তুঘরলকে পরাজিত করেন এবং বাংলার হিন্দু সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন। এ উপলক্ষে তিনি দনুজ মর্দন দেব উপাধি গ্রহণ করেন। গিয়াসউদ্দীন বলবনের ইতিহাসে তাকে দনুজ রায় বলে অভিহিত করা হয়েছে। দেব বংশ আরও কিছুকাল তার স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। যদিও এই সময়কার রাজাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অবশ্যে বাংলার মাহমুদ শাহী সুলতান ফিরোজ শাহের আক্রমণে দেব রাজবংশের পতন হয়।

## মধ্যযুগ এবং ইসলামী শাসন

সপ্তম শতাব্দীতে আরব মুসলিম ব্যবসায়ী ও সুফি ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে বাংলায় প্রথম ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। দ্বাদশ শতকে মুসলিমরা বাংলায় বিজয় লাভ করে এবং তারা ঐ অঞ্চল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১২০২ সালের শুরুর দিকে দিল্লী সালতানাত থেকে একজন সামরিক অধিনায়ক বখতিয়ার খিলজী বাংলা ও বিহারকে পরাজিত করেছিলেন। প্রথমদিকে বাংলা তর্কী জাতির বিভিন্ন গোত্র দ্বারা শাসিত হয়েছিল। পরবর্তীতে আরব, পারসীয়, আফগান, মুঘল প্রভৃতি অভিযানকারী জাতি দ্বারা বাংলা শাসিত হয়। মুসলিম শাসকদের অধীনে বাংলা একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছিল। কারণ শহরগুলো উন্নত হয়েছিল; প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ, সমাধিসৌধ এবং বাগান; রাস্তা এবং সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল; এবং নতুন বাণিজ্য পথগুলো সমৃদ্ধি ও নতুন সাংস্কৃতিক জীবন বয়ে নিয়ে এসেছিল।

## খিলজী শাসন

বখতিয়ার খিলজী ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বিহার আক্রমণ করেন। তিনি বিহারের পাল রাজবংশের অবশিষ্টাংশের পতন ঘটিয়ে বিহার দখল করেন। বখতিয়ার খিলজী এরপর বাংলা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ১২০৪ সালে ১৭ সৈন্যের এক দুর্ধর্ম অশ্঵ারোহী বাহিনী নিয়ে তীর্থকেন্দ্র নদীয়ায় আক্রমণ করেন। লক্ষণ সেন পলায়ন করেন এবং তিনি পূর্ব বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলমানদের কোন নৌবাহিনী না থাকায় তারা পূর্ববঙ্গ দখল করতে পারেনি। উচ্চাভিলাষী বখতিয়ার এরপর তিব্বত আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১২০৬ সালে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি তিব্বতে আক্রমণ করেন। এবং তিব্বতের কারামাতান নগর পর্যন্ত আগস্ত করেন। কিন্তু প্রচণ্ড শীত ও রসদপত্রের অভাবে বখতিয়ার খিলজীর এ অভিযান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।<sup>[৩১]</sup>

বখতিয়ার খিলজীর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে বিশুল্লাহুর উদ্ভব হয়। বখতিয়ারের অন্যতম সহকারী শিরণ খিলজী নিজেকে বাংলার সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু সিংহাসনের অপর দাবিদার মর্দান খিলজী শিরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। শিরণ মর্দানকে পরাজিত ও বন্দি করেন। মর্দান খিলজী দিল্লীর সম্রাট কুতুবউদ্দীন আইবেককে বাংলা আক্রমণের জন্য আহ্বান জানান। আইবেকের সেনাপতি কায়েমাজি রূপী শিরণকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন, এবং মর্দান খিলজীকে বাংলা গভর্নর নিয়োগ করা হয়।<sup>[৩২]</sup> মর্দান প্রথমত দিল্লীর অধীনস্থ থাকেন, কিন্তু কুতুবউদ্দীন আইবেকের মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মর্দান ক্রমশ অত্যাচারী হয়ে উঠলে খিলজী অমাত্যগণ তাকে হত্যা করেন এবং ইয়াজ খিলজীকে বাংলার সুলতান মনোনীত করেন।

ইওয়াজ থিলজী একজন সুদক্ষ ও রংকশলী সম্বাট ছিলেন। তিনি একটি নৌবাহিনী গঠন করেন এবং এই নৌবাহিনীর সাহায্যে তিনি বঙ্গ দখল করেন। তিনি বিহার, উড়িষ্যা ও কামরূপও (পশ্চিম আসাম) দখল করেন। কিন্তু ইওয়াজ এইসমস্ত রাজ্য সরাসরি রাজ্যভুক্ত করেননি, তিনি এই রাজ্যগুলোকে সামন্ত রাজ্যের মর্যাদা প্রদান করেন।<sup>[৩২]</sup> ইওয়াজের এই রাজ্য বিশ্বারের ফলে ১২২৫ সালে দিল্লীর সুলতান শামসউদ্দীন ইলতুতমিশ তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। যুদ্ধে ইওয়াজ পরাজিত হন। কিন্তু ইলতুতমিশ দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলে ইওয়াজ পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এবার যুদ্ধে ইলতুতমিশের পুত্র মাহমুদ নেতৃত্ব দেন, এবং যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ইওয়াজের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে।

## মামলুক শাসন

মামলুকগণ ছিলেন তুর্কী জাতির একটি বিশেষ ধরনের ভাড়াটে সেনাবাহিনী। দিল্লীতে এই সময় মামলুকগণই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং দিল্লী কর্তৃক নিয়োগকৃত বাংলার সকল গভর্নরগণও ছিলেন মামলুক। বাংলার মামলুক সুলতান তুঃরল তুগান খান ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি শুধু বাংলার উপরই আধিপত্য বিশ্বার করলেন না, তদুপরি এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন এবং বিহার ও বদায়ুন অঞ্চল নিজের শাসনাধীনে আনেন।<sup>[৩৩]</sup> যাই হোক দিল্লীর শাসনকর্তা তমর খানের নির্দেশে এক সেনাবাহিনী বাংলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তুঃরল খান পরাজিত হন এবং শেষ পর্যন্ত দিল্লীর শাসন মনে নেন।

১২৫১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার গভর্নর মুগীসউদ্দীন ইউজবাক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইউজবাক বাংলার দক্ষিণ দিক হতে আগত উড়িষ্যার একটি আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি উড়িষ্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং রাজধানী লুণ্ঠন করেন এবং একটি শ্বেত হস্তীও লাভ করেন। তুঃরলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইউজবাক বিহার ও আউয়াধ দখল করেন।<sup>[৩৪]</sup> এর ফলে তিনি পূর্ব ভারতব্যাপী এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীন্শ্঵র হয়ে পড়েন। ইউজবাক যতদিন জীবিত ছিলেন দিল্লীর সম্বাট ততদিন পর্যন্ত তাকে পরাজিত করতে পারেননি। ইউজবাক উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসামও দখল করেন। কিন্তু আসামের একটি বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তিনি নিহত হন।

দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সময় বাংলার গভর্নর মুগীসউদ্দীন তুঃরল বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি সমগ্র বাংলা ও বিহারের ওপর আধিপত্য স্থাপন করে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং তা তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সম্বাট বলবন মালিক তুরমতীকে এক বিরাট বাহিনী দিয়ে বাংলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি মুঘিসউদ্দীন তুঃরলের হাতে পরামর্শ হন। বলবন এবার দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ করেন সেনাপতি শিহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে। কিন্তু তিনি তুঃরলের হাতে পরাজিত হন।<sup>[৩৫]</sup> এর ফলে বলবন ১২৮০ সালে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে স্বয়ং বাংলা অভিযান করেন। তুঃরল প্রবল পরাক্রমের সাথে যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

## মাহমুদ শাহী রাজবংশ

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের মৃত্যুর পর তার পুত্র বুঘোর খান বাংলা দেশে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি মাহমুদ শাহ উপাধি গ্রহণ করেন, এজন্য তার বংশ মাহমুদ শাহী বংশ নামে পরিচিত হয়ে থাকে। দিল্লীর সম্বাট ছিলেন মাহমুদ শাহের পুত্রের পুত্র কায়কোবাদ। কিন্তু তিনি দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী নিজামউদ্দীনের হাতের ক্রীড়ানক হয়ে পড়েন। মাহমুদ শাহ তার পুত্রকে উদ্বারের জন্য এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দিল্লীর উজির নিজামউদ্দীন এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সরযু নদীর তীরে তার গতিরোধ করেন।<sup>[৩৬]</sup> যাই হোক বাংলা ও দিল্লীর মধ্যে রক্তস্কর্য সংঘর্ষ না হয়ে উভয়পক্ষের মধ্য সমর্পণ হয়। মাহমুদ শাহ তার বাহিনী নিয়ে লখনৌতিতে ফিরে আসেন ও সাগৌরবে রাজত্ব করতে থাকেন। অপরদিকে দিল্লীতে তার নির্দেশে সুলতান কায়কোবাদ মন্ত্রী নিজামউদ্দীনকে পদচূত করে রাষ্ট্রকে নিষ্কাশন করেন।

মাহমুদ শাহের পর তার পুত্র রুকুনউদ্দীন কায়কাউস বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। রুকুনউদ্দীন কায়কাউসের সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন আলআউদ্দীন থিলজী। ১৩০১ সালে আলআউদ্দীন থিলজী বাংলা আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কায়কাউস পরাজিত ও নিহত হন। থিলজী কায়কাউসের ভাই ফিরোজ শাহকে তার গভর্নর হিসেবে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ফিরোজ শাহ একজন খ্যাতিমান বিজেতা ছিলেন। তিনি থিলজীর নির্দেশে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেন এবং দেব বংশকে সম্মল উৎখাত করেন। এর ফলে পূর্ববঙ্গ চিরস্থায়ী ভাবে মুসলিম শাসনাধীনে চলে আসে।<sup>[৩৭]</sup> তার সময়েই বিখ্যাত আর্ডিলিয়া শাহ জালাল বঙ্গদেশে আগমন করেছিলেন এবং সিলেট জয় করেছিলেন। আলআউদ্দীন থিলজীর মৃত্যুর পরে তিনি স্বাধীনতা অর্জন করেন এবং কিছুদিন স্বাধীনভাবে রাজকার্য করার পর মৃত্যুবরণ করেন।

ফিরোজ শাহের পর তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ সমগ্র বাংলার অধিপতি হন। কিন্তু এ সময় দিল্লীর তুঃরলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঃরলক বাংলাদেশে সমরাভিযান করেন। ষড়যন্ত্রকারী ভাতা নাসিরউদ্দীন ইব্রাহীমের সহায়তায় রাজধানী লখনৌতি আক্রমণ করেন এবং বাহাদুর শাহ পরাজিত হন। গিয়াসউদ্দীন তুঃরলক বাংলাকে

সাতগাও, লখনৌতি ও সোনারগাঁও এই তিনি ভাগে ভাগ করেন এবং এই তিনি ভাগকে তিনজন পৃথক শাসকের হাতে নিযুক্ত করেন। কিন্তু গিয়াসউদ্দীন তৃষ্ণলক প্রত্যাবর্তন করলে বাহাদুর শাহ পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সাতগাওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খান তার বিরুদ্ধে সমরাভিয়ান করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

## বাংলা সালতানাত

### ইলিয়াস শাহী রাজবংশ

ইলিয়াস শাহ বাংলাদেশে ইরানের সিজিস্তান হতে আগত এক উদ্বাস্তু ছিলেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে বাংলায় নিযুক্ত দলীলির গভর্নর আলী শাহের সিলাহুদ্দার ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ক্ষমতা দখল করে নিজেকে বাংলার সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। ইলিয়াস শাহ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা দখল করে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে এক বিশাল সাধাজ্য কায়েম করেন। তিনি উত্তর প্রদেশ ও নেপালেরও বিরাট অংশ দখল করে নেন।<sup>[৩৭]</sup> এর ফলে দলীলির সুলতান ফিরোজ শাহ তৃষ্ণলক আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ১৫৫৩ সালে তিনি বাংলা আক্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহ বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চল দুটো হারিয়ে ফেলেন কিন্তু তিনি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে সক্ষম হন।



পঞ্চদশ শতকে নির্মিত বাগেরহাটের যাঁচ গম্বুজ মসজিদ। এটি বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক মসজিদ এবং বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান।

ইলিয়াস শাহের পরে সিকান্দার শাহ বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। ইতঃপূর্বে ফিরোজ শাহ তৃষ্ণলক বাংলা আক্রমণ করে বাংলা প্রদেশটি দখল করতে ব্যর্থ হন। ফলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন। সুনীর্ধ দুই বৎসর ফিরোজ শাহ বাংলা অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিকান্দার শাহের হাতে পরাজিত হন।<sup>[৩৮]</sup> সিকান্দার শাহ সাহিত্য ও স্থাপত্যের একজন একনিষ্ঠ প্রত্নপোষক ছিলেন। তার সময়ে বিশেষ করে স্থাপত্য ও ইমারত শিল্প ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। তার অমর কীর্তি হচ্ছে বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা। এই মসজিদটি তৎকালীন ভারতবর্ষের বৃহত্তম মসজিদ (দলীলির চেয়েও বৃহৎ) ছিল।

সিকান্দার শাহের পর আজম শাহ সিংহাসনে আসীন হন। তার শাসনকাল ছিল শাস্তিপূর্ণ এবং এ সময় তেমন যন্ত্র বিগ্রহের ঘটনা ঘটেনি। তার সময়ে চীনের রাষ্ট্রদুত মা হ্যান বাংলাদেশে আগমণ করেন। তিনি ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজকে বাংলায় আগমনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি রওয়ানাও হয়েছিলেন কিন্তু পথিমধ্যে মারা যান। ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বাংলার হিন্দুদের ক্ষমতায়িত করতে চেয়েছিলেন। বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। এবং হিন্দুদের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্তপ্রভু হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু এতে হিন্দুরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা দখল করে বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের অবসান ঘটান।

### গণেশীয় রাজবংশ

রাজা গণেশ প্রাথমিক জীবনে দিনাজপুরের ভাতুরিয়া অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। তিনি বাংলার এক আমির বায়েজীদ শাহকে ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করতে উৎসাহিত করেন। পরে বায়েজীদ শাহকে সরিয়ে তিনি নিজেই ক্ষমতা দখল করেন। গণেশ বাংলাদেশে সত্যপীর নামক এক নতুন পূজার উদ্ভাবন করেন। সত্যপীর একইসঙ্গে মুসলিম পীর ও হিন্দু দেবতার প্রতিভূত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। গণেশের পূর্বে বাংলার হিন্দুগণ মুসলমান শাসকদের প্রভাবে ব্যাপক মাত্রায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিলেন। এই ধর্মান্তর রোধ করার জন্য তিনি এই নতুন সত্যপীর প্রথার প্রচলন করেন।



শামসউদ্দীন আহমাদ শাহের আমলে নির্মিত সোনারগাঁও এর মহজমপুর শাহী মসজিদ।

রাজা গণেশ নিজ পুত্র জিতেন্দ্রদেবের পরিবর্তে মহেন্দ্রদেবকে পরবর্তী রাজা হিসেবে নিয়োগ করেন। এতে জিতেন্দ্রদেব অত্যন্ত বিকুল্ল হয়ে ওঠেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মুসলিম আমিরদের সহায়তায়, জালালউদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুহাম্মাদ শাহ একজন বিখ্যাত বিজেতা ছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী জোনপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। এবং তাদের কাছ থেকে বিহার প্রদেশটি ছিনিয়ে নেন। মুহাম্মাদ শাহের সময় আরাকান রাজ্য মেং তি মুন বার্মার হাত থেকে রক্ষার জন্য মুহাম্মাদ শাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং মুহাম্মাদ শাহ তাকে উদ্ধার করেন। এরপর থেকে আরাকান বাংলার একটি সামন্ত রাজ্য পরিণত হয়।<sup>[৩৯]</sup>

মুহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আহমাদ শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। তার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মতামত বিভাগিক। ফরেশতার মতে, তিনি তার মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন এবং ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ প্রাণপণে রক্ষা করেন। অপরপক্ষে গোলাম হোসেন বলেন, তিনি অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু ছিলেন। তিনি বিনা কারণে রক্তপাত করতেন এবং অসহায় নারী-পুরুষদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালাতেন। যাই হোক তিনি জাউনপুরের কাছে পরাজিত হন। এবং বিহার প্রদেশটি হারিয়ে ফেলেন। সাদী খান ও নাসির খান নামক দুইজন ক্রীতদাস, যারা তার অমাত্য পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাকে হত্যা করেন এবং বাংলার সিংহাসন দখল করেন।

## পরবর্তী ইলিয়াস শাহী রাজবংশ

সাদী খান ও নাসির খান নামক ক্ষমতা দখলকারী আমীরদের সরিয়ে মাহমুদ শাহ নামক ইলিয়াস শাহী বংশের একজন বংশধর বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। এর ফলে বাংলায় ইলিয়াস শাহী রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান মাহমুদ শাহের সময় বাংলার ইমারত ও স্থাপত্য শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের ইমারত নির্মাণ করে একে সুসজ্জিত করেন। এসব ইমারতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, ঢাকার বিনত বিবির মসজিদ, গৌড়ের বাইশগজী প্রাচীর প্রভৃতি।<sup>[৪০]</sup> এজন্য আনেক ঐতিহাসিক তার যুগকে অগাস্টান যুগ বলে অভিহিত করে থাকেন।

মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র বরবক শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। বরবক শাহ জোনপুরকে পরাজিত করে বিহার দখল করে নেন এবং কেদার রায় নামক তার একজন হিন্দু সেনাপতিকে এই অঞ্চলের গভর্নর নিয়োগ করেন। বরবক শাহের একজন সেনাপতি ইসমাইল গাজী আসামের রাজাকে পরাজিত করে কামরুপ (পশ্চিম আসাম) দখল করে নেন।<sup>[৪১]</sup> বরবক শাহের শাসনামলে বাংলাদেশ বিপুল সংখ্যক হাবশী ক্রীতদাসের আগমন ঘটে। বরবক শাহ এদের আনেকে সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদে নিয়োগ করেন। এই হাবশীরা পরে সাষাজের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঢ়ায়।

সুলতান ইউসুফ শাহ একজন দানশীল, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক শাসক ছিলেন। তিনি ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি দরবারে জানী-গুপ্তী, আলেম ও বিচারকদের আহ্বান করতেন। পরবর্তী সুলতান ফতেহ শাহও একজন দয়ালু, কর্মসূত ও ক্ষমতাশালী সম্ভাট ছিলেন। তিনি সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজা শাসন করতেন। তার সময়ে হাবশী ক্রীতদাসগণ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তিনি এই হাবশী সেনাবাহিনী ভঙ্গে দিতে উদ্যত হন। ফলে হাবশী সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে এবং তাকে হত্যা করে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করে। এর ফলে বংলার ইলিয়াস শাহী রাজবংশের পতন ঘটে।

## হোসেন শাহী রাজবংশ

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ জোরদখলকারী হাবশী শাসকদের সরিয়ে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে আরব দেশের ইয়েমেন (থেকে বাংলাদেশে আগত এক উদ্বাস্তু ছিলেন। হোসেন শাহ বাংলার সীমান্তবর্তী রাজসমূহ যেমন কামরুপ (পশ্চিম আসাম), বিহুত (উত্তর বিহার) ও চট্টগ্রাম (আরাকানের হাত থেকে) জয় করেন।<sup>[৪২]</sup> তবে তিনি দক্ষিণ বিহার জয় করতে ব্যর্থ হন কারণ দিল্লীর সম্ভাট সিকান্দার লোদী তার পুরোহী উত্ত অঞ্চল দখল করে নেন। হোসেন শাহের শাসন আমলে সাহিত্য ও স্থাপত্য কলার ব্যাপক বিকাশ ঘটে। তিনি ছিলেন হিন্দু মুসলিম সৌভাগ্যের প্রতীক। আনেক ঐতিহাসিক তার যুগকে বাংলার স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।

হোসেন শাহের পর তার পুত্র নুসরাত শাহ বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। পিতার মত তিনিও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পিতার আমলে সাহিত্যকলা ও স্থাপত্য শিল্পের যে বিকাশ ঘটে তা তার সময়ও অব্যাহত থাকে। নসরত শাহের সময় ভারতবর্ষে আফগান শাসনের অবসান হয় ও মুঘল শাসনের পতন ঘটে। বিপুল সংখ্যক আফগান আমীর পলায়ন করে বাংলাদেশে আসেন। নসরত শাহ সম্ভাট মাহমুদ লোদী ও জালাল খানের সঙ্গে এক্রিবদ্ধ হয়ে মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অঞ্চল অগ্রসর হন। কিন্তু ঘাগরার যুদ্ধে মিত্রবাহিনী পরাজিত হয়।<sup>[৪৩]</sup> নসরত শাহ বাবরের সাথে একটি সঞ্চিতুক্তি করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করেন।

নসরত শাহের পর তার পুত্র ফিরোজ শাহ বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। কিন্তু তার খুল্লতাত মাহমুদ শাহ তাকে হত্যা করে ক্ষমতায় বসেন। এর ফলে রাজপরিবারে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। বিহুতের শাসনকর্তা মখদুম আলম স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন। কিন্তু মাহমুদ শাহ তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। এসময় বিহারের শাসনকর্তা জালাল খান তার অভিভাবক



সোনা মসজিদটি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে তৈরি হয়।

শের খানের শাসনে অর্তিষ্ঠ হয়ে মাহমুদ শাহকে বিহার আক্রমণের জন্য আহ্বান জানান। মাহমুদ শাহ বিহার আক্রমণ করেন কিন্তু তিনি পরাজিত হন। অতঃপর ১৫৩৮ সালে শেরশাহ বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করে নেন।<sup>[৪৪]</sup> ফলে বাংলার হোসেন শাহী রাজবংশের পতন ঘটে।

## পাখতুন শাসন

পাখতুনগণ ছিলেন আফগানিস্থান থেকে আগত উদ্বাস্ত এবং তারা পাঠান নামেও পরিচিত ছিলেন। পাখতুনগণ ছিলেন ভারতবর্ষের অধিশ্঵র এবং তারা ভারতে লোদী বংশ নামে একটি শক্তিশীল রাজবংশ স্থাপন করেন। পরবর্তীতে পানিপথের যুদ্ধে মুঘলদের হাতে তাদের পরাজয় হয় এবং তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

## সুরী রাজবংশ

সুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শের শাহ সুরী প্রাথমিক জীবনে বিহারের সাসারাম অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র জায়গীরদার ছিলেন। পরে নিজ প্রতিভাবলে তিনি বিহারের শীসনকর্তা বিহার খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন এবং বিহারের উপ প্রশাসকের পদে নিযুক্ত হন। ১৫৩৬ সালে শের শাহ বাংলার শীসনকর্তা মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে মাহমুদ শাহ কিউল থেকে সিকরিগলি পর্যন্ত অঞ্চলটি শের শাহকে সমর্পণ করেন। ১৫৩৭ সালে শের শাহ দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করেন এবং এবার সষ্টাট মাহমুদ শাহকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। শের শাহ নিজেকে বাংলার সষ্টাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ফরিদউদ্দীন শের শাহ উপাধি ধারণ করেন।<sup>[৪৫]</sup>

শেরশাহ বাংলা ও বিহারের বিরাট ভূখণ্ডের অধিকারী হয়ে বসলে মুঘল সষ্টাট হুমায়ুন চুনার দখল করে বাংলা আক্রমণ করেন। সুচতুর শেরশাহ সম্মুখ সমর লিপ্ত না হয়ে বাংলাদেশ পরিত্যাগ করেন এবং পুরোক্ষভাবে বারানসী, রোটাস ও জোনপুর দখল করে কনৌজের দিকে অগ্রসর হন। হুমায়ুন আগ্রার পাথে যাত্রা করলে বক্তারের নিকট চৌসা নামক স্থানে শের শাহ তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ১৫৪০ সালের ১৭ই মে কনৌজ এর বিলগামের যুদ্ধে শের শাহ হুমায়ুনকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে সুরী বংশের সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।<sup>[৪৬]</sup> শের শাহ হচ্ছেন বাংলার একমাত্র মুসলিম সষ্টাট যিনি উত্তর ভারত জুড়ে সাষাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শেরশাহের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের সেনাধ্যক্ষগণ জোর্জপুত্র আদিল খানের পরিবর্তে ইসলাম শাহকে উত্তোলিত করেন, কারণ ইসলাম শাহ রাজপুত্র অবস্থায় অধিকতর সামরিক প্রতিভা প্রদর্শন করেছিলেন। জেষ্ঠ ভ্রাতা আদিল খান ইসলাম শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আদিল খান তার বাহিনী নিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু ইসলাম শাহের হাতে পরাজিত হন।<sup>[৪৭]</sup> ইসলাম শাহের সময় মুঘল সষ্টাট হুমায়ুন রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য তার নিকট প্রার্থনা জানান। কিন্তু তিনি এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ইসলাম শাহের শীসনকাল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল এবং এ সময় তেমন কোন যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা ঘটেনি।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর সুরী সাষাজ্যে বিশ্বালার উদ্ধৃত হয়। ইসলাম শাহের পর তার পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু শীঘ্ৰই তিনি আদিল শাহ সুরী (এই আদিল শাহ পূর্ববর্তী আদিল শাহ হতে পৃথক) কর্তৃক পদচ্যুত হন। আদিল শাহ পরবর্তীতে ইবাহীম শাহ সুরী নামক সুরী বংশীয় অপর একজন দাবীদারের কাছে পরাজিত হন এবং তিনি দিল্লী ও আগ্রা দখল করে বসেন। ইবাহীম শাহ অবার সিকান্দার শাহ সুরী কর্তৃক পরাজিত হন এবং সিকান্দার শাহ নিজেকে ভারতবর্ষের সষ্টাট হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবে ভারতীয় যুদ্ধে সুরী সাষাজ্য বিপর্যস্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়।

## কররানী রাজবংশ

১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাজ খান কররানী বাংলার দুর্বল সুলতান গিয়াসউদ্দীনকে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেন। তাজ খান দিল্লীর সুরী বংশীয় সষ্টাট ইসলাম শাহের একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। কিন্তু তার পরে আদিল শাহ অনৈতিকভাবে সিংহাসন দখল করলে তাজ খান বাংলায় পলায়ন করেন এবং এখানে থেকেই তিনি আদিল শাহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এখানে তিনি বাহাদুর শাহের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং তার নতুনে আদিল শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন।<sup>[৪৮]</sup> তাজ খান বাংলার মাটিতে তার ক্ষমতার বীজ শক্তভাবে প্রোথিত করেন। পরবর্তীতে সুলতান গিয়াসউদ্দীনকে পরাজিত করে তিনি বাংলার সিংহাসন দখল করেন।

তাজ খানের পর তার ভাই সুলায়মান খান কররানী বাংলার মসনদে অসীন হন। দিল্লীতে হুমায়ুন কর্তৃক মুঘল সাষাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর দলে দলে আফগান অভিবাসীগণ বাংলায় এসে বসবাস শুরু করে। ফলে সুলায়মানের অধিপত্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুলায়মানের সাথে উড়িষ্যার সষ্টাট মুকুন্দ হরিচন্দনের বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। বিরোধের কারণ

বাংলার সিংহাসনের অন্যতম দাবীদার ইংরাজীম সুরীকে আঁশ্য প্রদান করা। ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলায়মান তার পুত্র বায়জীদ খান ও সেনাপতি কালাপাহাড়কে এক বিশাল সেনাবাহিনী সহ উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন। রাজা হরিচন্দন মুসলিম বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করেন। পুরীসহ সমস্ত উড়িষ্যা কররানী রাজ্যের অধীনস্থ হয়।<sup>[৪৯]</sup>

সুলতান দাউদ খান কররানী সুলায়মান খান অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনচেতা ও আগামী মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। মুঘল সন্ধাট আকবর সেনাপতি মুনিম খানকে বাংলা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু মুঘল সেনাপতি পরাজিত হন। ১৫৭৪ সালে সন্ধাট আকবর স্বয়ং পাটনা অবরোধ করেন। ফলে দাউদ খান পরাজিত হন। ১৫৭৬ সালে মুঘল ও বাঙালী সেনাবাহিনী রাজমহলের প্রাসারে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের প্রথমদিকে বাঙালী বাহিনী বিজয় অর্জন করে। কিন্তু পরবর্তীতে সেনাপতি করতু খান ও বিক্রমাদিত্য বিশ্বাসঘাতকতা করলে তারা পরাজিত হয়।<sup>[৫০]</sup> ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাসহ সমগ্র পূর্ব ভারত মুঘল সাম্রাজ্যের পদান্ত হয়।

## মুঘল যুগ

বাংলার পশ্চিমাংশ ও উত্তরাংশ ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সন্ধাট আকবরের সময় মুঘল সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হয়। আফগান কররানী বৎশের শাসক দাউদ কররানীকে হত্যার মাধ্যমে মুঘল শাসনের সূত্রপাত ঘটে।<sup>[৫১]</sup> কিন্তু বাবো ভূইয়াদের পরাজয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মুঘল আধিপত্য আরম্ভ হয়। বাংলার বিভিন্ন সুবাদারগণ বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সুবাদার ছিলেন ইসলাম খান, মীর জুমলা, শায়েস্তা খান প্রমুখ।



১৬৬০ সালে রাখাইনদের উপর মুঘল আক্রমণ।

## ইসলাম খান

মুঘল সন্ধাট জাহাঙ্গীরের সময় ১৬০৮ সালে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি রাজধানী ঢাকা থেকে বাংলার শাসন কাজ পরিচালনা করতেন, যার নামকরণ করা হয়েছিল জাহাঙ্গীর নগর। বিদ্রোহী রাজা, বাবো-ভূইয়া, জমিদার ও আফগান নেতাদের নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল তার প্রধান কাজ। তিনি বাবো ভূইয়াদের নেতো মুসা খানের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ১৬১১ সালের শেষের দিকে মুসা খান পরাজিত হন।<sup>[৫২]</sup> ইসলাম খান যশোরের প্রতাপাদিত, বাকলার রামচন্দ্র এবং ভুলুয়া রাজ্যের অনন্ত মানিক্যকে পরাজিত করেছিলেন। এরপর তিনি কোচবিহার, কোচ হাজো এবং কাছাড় রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, এইভাবে চট্টগ্রাম ব্যতীত সমগ্র বাংলায় আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন।



১৮ শতকে ঢাকায় সৃষ্টি বাংলা মসলিন পরিহিত একজন মহিলা।

## মীর জুমলা

মীর জুমলা বাংলার একজন বিখ্যাত সুবাদার ছিলেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে গোলকুণ্ডায় একজন হীরক ব্যবসায়ী হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। এ সময়ই তিনি কোহিনুর নামে বিখ্যাত হীরক খণ্ডের অধিকারী হন। এ হীরক খণ্ডটি পরে তিনি সন্ধাট শাহজাহানকে উপহার দেন। তার সময়ে কোচবিহার (পশ্চিম আসাম) ও আসামে (পূর্ব আসাম) মুঘল অভিযান প্রেরিত হয়। গহীন জঙ্গল পার হয়ে কোচবিহারে মুঘল বাহিনী প্রবেশ করলে প্রাণভয়ে রাজা প্রাণনাথ রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান। কোচবিহার দখলের পর মীর জুমলা আসামে অভিযান পরিচালিত করেন। মুঘল বাহিনী অনায়াসে কামতা, গোয়লপাড়া, গোহাটী প্রভৃতি সীমান্তবর্তী শহর দখল করে নেয়। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত যুদ্ধে রাজধানী ঝাড়গাও দখলকৃত হয় এবং রাজা জয়মুজ নারায়ণ আত্মসমর্পণ করেন।<sup>[৫৩]</sup>

## শায়েস্তা খান

১৬৬৩ সালে শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বাংলার দীর্ঘতম গভর্নর ছিলেন। তার সময়ে বাংলার সুখ ও শান্তি চরমে ওঠে। কথিত রয়েছে তার সময়ে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। শায়েস্তা খানের বিখ্যাত কীর্তি আরাকানের জলদস্যদের হাত থেকে চট্টগ্রামের পুনর্দখল করা। ১৬৬৫ সালে শায়েস্তা খান নিজ পুত্র বৰ্জুর্গ উমেদ খানকে আধিনায়ক মনোনীত করে আরাকান সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৬৬৬ সালের ২৩ ও ২৪ জানুয়ারী সংঘটিত

কার্ত্তালিয়ার যুদ্ধে মগ বাহিনী সম্পূর্ণ রূপে বিঘ্নিত হয়। পরে তারা কর্ণফুলী নদীতে প্রতিরোধ গড়ে তুললে মুঘল নৌবহরের কামানের সামনে পরাশ্র হয়। চট্টগ্রামে পুনরায় মুঘল আধিপত্য স্থাপিত হয়।<sup>[৫]</sup> শায়েস্তা খান এর নতুন নামকরণ করেন ইসলামাবাদ। চট্টগ্রাম দখল করে মগদের হাতে বন্দী অসংখ্য নর নারীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

## বাংলার নবাব

মুর্শিদকুলী খান ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর সুবাহ বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি রাজধানী মাখসুদাবাদে স্থানান্তর করেন যা তার নাম থেকে মুর্শিদাবাদে নামকরণ হয়। তিনি একজন ধর্মনির্ণয়, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাদরদী শাসক ছিলেন। তিনি ইসলামী শরীয়ত অনুসারে কর্তৃতাবাবে দেশ শাসন করতেন। তিনি সঞ্চারে দুবার স্বয়ং বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তার সময়ে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বাংলা তুর্কী, পারসী, মাজাপাহী, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।<sup>[৫]</sup> তার সময়ে বাংলার হৃগলী একটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত হয়।

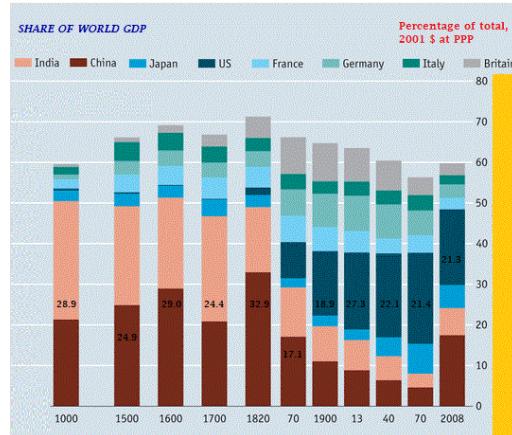
মুর্শিদকুলী খানের পর তার জামাতা সুজাউদ্দিন খান বাংলার নবাব হন। তিনি ত্রিপুরা আক্রমণ করেন এবং ত্রিপুরা বাংলার একটি করদ রাজ্যে পরিণত হয়। তিনি বীরভূমের শাসক বদিউজ্জামানের বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি কর্তৃতাবাবে ইউরোপীয় বণিকদের দস্তক প্রথা ও শুল্ক ফাঁকি বন্ধ করেন। তার সময়ে ইংরেজ, ফরাসি ও পর্তুগিজ বণিকগণ কোনুকপ শুল্ক ফাঁকি দিতে পারতেন না। উপরন্তু নবাবকে ইউরোপীয় বণিকদের নজরানা দিয়ে সবসময় সন্তুষ্ট রাখতে হত। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ নবাবকে তুষ্ট করার জন্য তিনি লক্ষ টাকা নজরানা দেন।<sup>[৫]</sup>

নবাব আলীবর্দী খানের সময় বাংলায় রাজনৈতিক বিশঙ্খলা দেখা দেয়। তার সময়ে মারাঠাগণ বাংলা আক্রমণ করে। তবে আলীবর্দী খান একজন বিখ্যাত মহাবীর ছিলেন। তিনি সুনীর দশ বছর মারাঠাদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। এবং বাংলার স্বাধীনতা বক্ষা করতে সক্ষম হন। তবে তিনি উড়িষ্যা প্রদেশটি মারাঠাদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।<sup>[৫]</sup> নবাব আলীবর্দী খানের পরে সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার নবাব হন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবর্তীর্ণ হন। প্রথমদিকে কলকাতার যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করলেও শেষ পর্যন্ত পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। ফলে বাংলার নবাবী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

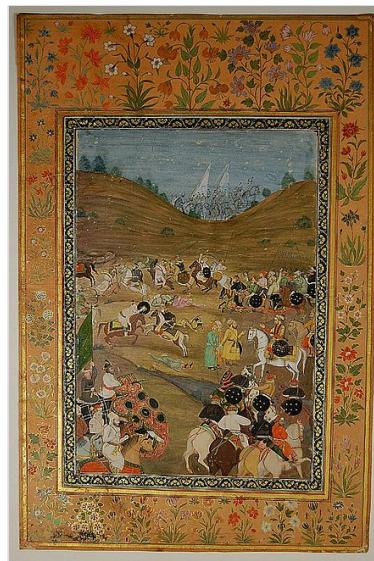
## ঔপনিবেশিক শাসন

বাংলায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে। ধীরে ধীরে তাদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করে।<sup>[৫]</sup> ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পর কোম্পানির হাত থেকে বাংলার শাসনভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে। ব্রিটিশ রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন একজন ভাইসরয় প্রশাসন পরিচালনা করতেন।<sup>[৫]</sup> ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশে অনেকবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এর মধ্যে ছিয়াত্তরের মহস্তর নামে পরিচিত ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ আনুমানিক ৩০০ লাখ লোক মারা যায়।<sup>[৬]</sup>

১৯০৫ হতে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের ফলশ্রুতিতে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছিল, যার রাজধানী ছিল ঢাকায়।<sup>[৫]</sup> তবে কলকাতা-কেন্দ্রিক রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের চরম বিরোধিতার ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায় ১৯১১ সালে। ভারতীয় উপমহাদেশের দেশভাগের সময় ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে আবার বাংলা প্রদেশটিকে



এংগাস মেডিসনের হিসাব অনুযায়ী অর্থনীতির দিক দিয়ে প্রধান অঞ্চলগুলোর ১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বের জিডিপি এর ক্ষেত্রে অবদান।<sup>[৫]</sup> অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত জিডিপির ক্ষেত্রে ভারত ছিল এক বৃহত্তম অর্থনীতি, যার অর্ধেক মান মুঘল বাংলা থেকে এসেছিল।



আলীবর্দী খান (বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের ভাইসরয়) দুজন কয়েদিকে বন্দী করছেন।

ভাগ করা হয়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হয়, আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হয়। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গের নাম পাল্টে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। [৬১]



পলাশীর যুদ্ধের উপর শিল্পী ফিরোজ মাহমুদের আঁকা ছবি, শিরোনাম: 'উপমহাদেশের রাজত্বের শেষের শুরু: আমার পূর্বপুরুষদের সময়'

## পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত করে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয় যথা ভারত ও পাকিস্তান। মুসলিম আধিক্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সীমানা চিহ্নিত করা হয় যার ফলে পাকিস্তানের মানচিত্রে দুটি পথক অঞ্চল অনিবার্য হয়ে ওঠে যার একটি পূর্ব পাকিস্তান এবং অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল প্রধানত পূর্ব বাংলা নিয়ে যা বর্তমানের বাংলাদেশ। পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস মূলত: পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হাতে নিশ্চিত ও পোষণের ইতিহাস যার অন্য পিঠে ছিল ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সামরিক শাসন।

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ভূমি সংস্কারের অধীনে জমিদার ব্যবস্থা রদ করা হয়। [৬২] কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাগত শুরুত্ব সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংঘাতের প্রথম লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পায়। পরবর্তী দশক জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে নেয়া নানা পদক্ষেপে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষ্রান্ত দানা বাঁধতে থাকে।

পাকিস্তানি প্রভাব ও সৈন্যের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ ছিল মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের যুক্তফন্ট নির্বাচনে বিজয় এবং ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খানকে পরাজিত করার লক্ষ্য নিয়ে সশ্রিত বিরোধী দল বা 'কপ'-প্রতিষ্ঠা ছিল পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বমূলক আন্দোলনের মাইলফলক। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারের প্রশ্ন ১৯৫০-এর মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে।



বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ-দৌলা।

## স্বাধীনতা আন্দোলন

### ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন ছিল পূর্ব বাংলার ইতিহাসে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন যার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়। পাকিস্তানের সরকারী কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। মুফতি নাদিমুল কামার আহমেদ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। [৬৩] ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বিভাজনের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সংগঠিত হয়; তার দুটি অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান এর মধ্যে ব্যাপক সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং ভাষাগত পার্থক্য বজায় ছিল। এ পার্থক্য পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।



বাংলায় রবার্ট ক্লাইভের বিজয় দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আধিপত্তোর সূচনা করে

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রে একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে উন্নুকে ঘোষণা করে, এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষ্রান্ত ছড়িয়ে পড়ে। নতুন আইন প্রনয়নের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং গণ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে, সরকার সকল ধরনের গণ সমাবেশ ও প্রতিবাদ আন্দোলন বেআইনি ঘোষণা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীরা এই আইন অমান্য করে এবং ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি বিরাট আন্দোলন সংগঠিত করে। [৬৪] ঐদিনে বহু ছাত্র বিক্ষ্রান্তকারীদের পুলিশ হত্যা করে এবং এই আন্দোলন তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পোঁছে।

এই হত্যাকাণ্ডের পরে সারা দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভ ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ যার পরবর্তীতে নামকরণ করা হয় আওয়ামী লীগ। কয়েক বৎসর ব্যাপী সংঘর্ষ চলার পর, কেন্দ্রীয় সরকার অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে এবং ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৫৯ সালের ১৭ নভেম্বর, ইউনেস্কো, ২১ ফেব্রুয়ারিকে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।<sup>[৬৪]</sup> বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন দিবস, একটি জাতীয় দিবস হিসাবে পরিগণিত হয়। শহীদ মিনার স্মৃতিস্তম্ভটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আন্দোলন ও তার শহীদদের স্মরণে নির্মিত হয়।



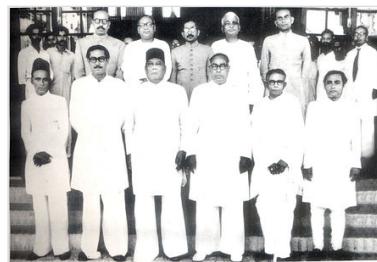
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মিছিল হয়েছিল

## রাজনীতিঃ ১৯৫৪-১৯৭০

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ধীরে ধীরে বিরাট পার্থক্য গড়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার একটি সংখ্যালঘু অংশ ছিল, কিন্তু রাজস্ব বরাদ্দ, শিল্প উন্নয়ন, কৃষি সংস্কার ও নাগরিক প্রকল্পসমূহের ব্রহ্মপুর অংশের ভাগীদার ছিল তারাই। পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক পরিষেবাগুলো মূলত পাঞ্জাবি জাতি দ্বারা অধিকৃত ছিল।<sup>[৬৫]</sup> পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে শুধুমাত্র একটি রেজিমেন্ট ছিল বাঙালীদের। অনেক বাঙালী পাকিস্তানিদের কাশ্মীর ইস্যুতে স্বত্বাবজাত উৎসাহ বোধ করেনি, কারণ তারা মনে করত এটি পূর্ব পাকিস্তানকে আরও বেশি ঝুঁকির মুখে ফেলবে এবং এটি শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্বের প্রতি ভুমকি হয়ে দেখা দেবে।

১৯৬৮ সালের গোড়ার দিকে শেখ মুজিব ও অন্যান্য ৩৪ জন নেতার বিরুদ্ধে আগরতলা ব্রহ্মস্তুপ মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ভারতবর্ষের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করছিল। যাইহোক এই বিচারের ফলে একটি গণ আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং সকল বন্দীদের মুক্ত করার আচ্ছান্ন জানানো হয়। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কারাগারে একজন বিদ্রোহী, জহুরুল হককে নির্মভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর ফলে আন্দোলন আরও বেগবান হয় এবং পরবর্তীতে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। গণআন্দোলন পরবর্তীকালে '৬৯ এর গণ অভূথানে রূপ লাভ করে।<sup>[৬৬]</sup>

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খান কে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পরবর্তীকালে নতুন রাষ্ট্রপতি দেশের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থগিত করে দেন। যাইহোক কিছু সংখ্যক ছাত্র গোপনীয়তার সাথে আন্দোলন বজায় রাখে। সিরাজুল আলম খান এবং কাজী আবেফ আহমেদের নেতৃত্বাধীন '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী' নামে একটি নতুন দল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে, ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবরের জন্য একটি নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।<sup>[৬৭]</sup> পশ্চিমের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক নতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগকে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত করে।



১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভা



শেখ মুজিবুর রহমান

## স্বাধীনতার প্রস্তুতি

আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের বেশিরভাগ অংশে ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং পাকিস্তান সরকার সাংবিধানিক প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা শুরু করে। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রদেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হয়, সেইসাথে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। তবে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেন, যা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষেপের সূচনা করে।<sup>[৬৮]</sup> ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াসের এক ছাত্র নেতা আসম আবদুর রবের নির্দেশে বাংলাদেশের নতুন (জাতীয় পতাকা উত্থাপিত হয়।

আন্দোলনকারী ছাত্রনেতারা দাবী করে যে শেখ মুজিবুর রহমান অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করুন, কিন্তু মুজিবুর রহমান এই দাবীতে সম্মত হতে অসীকৃতি জাপন করেন। বরং তিনি ৭ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য একটি জনসভায় তার পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণা করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৩০ মার্চ ছাত্রনেতা শাহজাহান সিরাজ স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াসের নির্দেশে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সামনে স্বাধীনতার ইন্দোর পাঠ করেন।<sup>[৬৯]</sup> ৭ মার্চ তারিখে সাহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটি জনসাধারণের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর চলমান স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসরতা সম্পর্কে জন সাধারণকে উদ্ব�ুদ্ধ করেন।

আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পরবর্তীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৭ই মার্চ এর ভাষণে, পাকিস্তানি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে একটি আসন্ন যুদ্ধের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে প্রস্তুত থাকার জন্য আহ্বান জানান।<sup>[৭০]</sup> যদিও তিনি সরাসরি স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেননি, কারণ তখনও আলোচনা চলছিল, তিনি তার শ্রেতাদেরকে কোনও এক সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকার জন্য আহ্বান জানান। শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল চাবিকাঠি বলে মনে করা হয়, এবং এ ভাষণের বিখ্যাত উক্তি ছিল:

এবাবের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবাবের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।

## স্বাধীনতার যুদ্ধ

২৬ মার্চের প্রথমার্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক সামরিক অভিযান শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং রাজনৈতিক নেতারা বহুবিভক্ত হয়ে যান। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার আগে, শেখ মুজিবুর রহমান একটি স্বাক্ষরিত নেট প্রেরণ করেন যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এই নেটটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এর বেতার ট্রান্সমিটার দ্বারা প্রচারিত হয়। বাংলাদেশী আর্মি অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট রেডিও স্টেশন দখল করেন এবং ২৭ মার্চ সন্ধ্যার দিকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন।<sup>[৭১]</sup>

সামরিক উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে ১১ জন কমান্ডারের অধীনে ১১ টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।<sup>[৭২]</sup> এই আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর সাথে সাথে যুদ্ধের জন্য আরও তিনটি বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়ঃ জেড ফার্স, এস ফার্স এবং কে ফার্স। এই তিনটি বাহিনীর নাম উক্ত বাহিনীর কমান্ডারদের নামের প্রথম অক্ষর থেকে উদ্ভৃত হয়েছে। মেহেরপুর সরকার কর্তৃক প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ বেশিরভাগ অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল, যা ভারতে কর্তৃক সমর্থিত ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং বাংলার মুক্তি বাহিনী এর মধ্যে যুদ্ধের সময় আনুমানিক এক কোটি বাঞ্ছালী, প্রধানত হিন্দু, ভারতের আসাম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আধ্যায় নেয়। ভারত বাংলাদেশকে নানাভাবে সাহায্য করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের অবদান অপরিসীম।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ভারতের সহানুভূতি ছিল এবং ১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশীদের পক্ষে যদ্বি অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দুই সপ্তাহের একটি সংক্ষিপ্ত এবং ব্যাপক বিপ্লবী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী এবং পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাধ্যক্ষগণ ভারত ও বাংলাদেশের মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণকালে শুধুমাত্র কয়েকটি দেশ নতুন রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। দ্বিতীয় বিপ্লবীয় পর পৃথীবীর ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৯০ হাজারেরও বেশি পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।<sup>[৭৩][৭৪]</sup>



১৬ ডিসেম্বরে সাহরাওয়ার্দী উদ্যানে  
পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

### প্রাথমিক সরকার ব্যবস্থা

#### অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সরকার। এই সরকার দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা জারি করে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সংবিধান প্রণয়ন করে এবং মৌলিক নীতিমালা হিসাবে সমতা, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ এবং সামরিক সর্বাধিনায়ক ছিলেন এম এ